উৎপাদক ও রফতানিকারকের দেশে

মোস্তাফা জব্বার

খবরটি সবার চোখে না-ও পড়ে থাকতে পারে। এ সপ্তাহে বা সামনের সপ্তাহে বা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মাঝেই বাংলাদেশে উৎপাদিত স্মার্টফোন বাজারে আসছে। একটি মডেলের পর অন্তত আরও দুটি মডেল বাজারে ছাড়া হবে। এরপর এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে তৈরি ফিচার ফোন এবং কমপিউটারও বাজারে ছাড়বে। আমরা এখন সেই মাইলফলকের যুগে পা রেখেছি।

গত কয়েক বছর ধরেই বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বলে আসছে, শিল্পবিপ্লবের চতুর্থ স্তরটা একদমই ভিন্নমাত্রা নিয়ে এসেছে। তারা মনে করে, ১৭৮৪ সালে আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ১৮৭০ সালের বিদ্যুৎ, ১৯৬৯ সালের ইন্টারনেট ও ১৯৯১ সালের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের ওপর ভর করে শিল্পবিপ্লবের চারটি স্তর বিকশিত হয়েছে। তাদের ধারণা মতে, মানুষ তার হাতে যখনই যে হাতিয়ার বা প্রযুক্তি পেয়েছে তার ওপর ভর করেই শিল্পবিপ্লবের চাকাকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু আমাদের অংশগ্রহণ এই চারস্তরের শিল্পবিপ্লবের কোথাও কি আছে? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে তো আমরা নেই। ১৯৬৯ সালের ইন্টারনেট বা ১৯৯১ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের স্তরটাতে আমরা নিজেরা সরাসরি যুক্ত হই ২০০৬ সালে, যখন আমরা প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হই। এর আগে ইন্টারনেট ও ই-মেইল এসব শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় থাকলেও হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া আর কারও মাথায় এসব বিষয় প্রবেশ করেনি। বরং একে তথ্যপ্রযুক্তির বিষয় হিসেবে আলাদা করে দেখা হতো। ২০০৮ সালে আমাদের দেশে মাত্র ১২ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল। ইন্টারনেটনির্ভর কোনো শিল্পায়নের সাথে আমাদের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততাই ছিল না। ফলে আমরা শিল্প-কলকারখানার উৎপাদকের জায়গাতে যেতেই পারছিলাম না।

২০১৭ সালে ইন্টারনেটের অবস্থাটি অবশ্য আশাব্যঞ্জক। প্রায় সাড়ে সাত কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আমাদের। তবে ইন্টারনেটকে শিল্প-কলকারখানা-শিক্ষা ও সরকারের জন্য ব্যবহারের গতিটা পশ্চিমা বা শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে বহুগুণ কম। দেশটাকে ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি অভাবনীয়। কিন্তু আমাদের শুরুটা দেরিতে ছিল বলে অগ্রগতির সূচকে আমরা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে পিছিয়ে। পশ্চাৎপদ শিক্ষা, শিল্পায়নের অভাব, ঔপনিবেশিক শাসন ১৯৭১ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর এই দেশটাতে যত শিল্প-কলকারখানা ছিল তার সবই জাতীয়করণ করা হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ ছিল সেইসব কারখানার মালিকেরা কেউ বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল না।

কমপিউটার বিষয়টা আরও ভিন্নমাত্রার। সেই ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কমপিউটার আসে বাইরে থেকে। সেই থেকেই কমপিউটারের সব কিছু আমরা আমদানিই করে আসছি। অন্যদিকে সুইডেনের ভলভো কোম্পানির জন্য আমরা সফটওয়্যার বানিয়ে দিলেও নিজের দেশের সফটওয়্যারের বাজারটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদেশিদের হাতে চলে গেছে। বিশেষ করে সরকারের বড় বড় কাজ ও ডিজিটাল রূপান্তরের কাজগুলো আমরা নিজেরা করার সুযোগ পাই না। সফটওয়্যারের জন্য ৫ বছর ধরে ১০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় ও ১ বিলিয়ন ডলার নগদ থাকার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। যন্ত্রপাতি কেনার সময় বলা হয়, আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাত ব্র্যান্ড হতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে অংশ নিতে পারে না। এর বাইরে ছিল শুল্ক জটিলতা। এই ধারাবাহিকতায় ব্যতিক্রম ঘটান দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

'আমরা বাংলাদেশে কমপিউটার বানাব এবং সেই কমপিউটার বিদেশে রফতানি করব'– স্বপ্ন, ইচ্ছা, নির্দেশনা বা আদেশ যাই বলি না কেন, এটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য। ৬ আগস্ট ২০১৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের বৈঠকে তিনি এই ঘোষণা দেন। এমন স্বপ্নটা তিনি ২০১১ সালেও দেখেছিলেন, যখন তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য দোয়েল ল্যাপটপের উদ্বোধন করেন।

২০১৫ সালের ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত পুনর্গঠন করা ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় তিনি কমপিউটার বানানোর ও রফতানির কথা বলেন। সেদিন অনেক সময় ধরে তথ্যপ্রযুক্তির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। চমৎকার এজেন্ডা ছিল সভার। এজেন্ডার বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তও দিচ্ছিলেন। সভা প্রায় শেষ স্তরে ছিল। আমি তার অনুমতি নিয়ে বিবিধ আলোচ্যসূচিতে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ পাই। আমি তাকে জানাই, আমরা শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছি। প্রধানমন্ত্রী আপনি নিজে প্রত্যাশা করেন, আমাদের সব ছাত্রছাত্রী ল্যাপটপ হাতে নিয়ে স্কুলে যাবে। আপনি যদি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চান, তবে এখনকার পরিস্থিতিতে আপনাকে কমপক্ষে ৪ কোটি ডিজিটাল ডিভাইস আমদানি করতে হবে। প্রতিটি ল্যাপটপের দাম যদি ৩০ হাজার টাকা করেও হিসাব করেন, তবে একটু ভেবে দেখুন এর ফলে আমরা কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এই খাতে বিদেশে পাঠাব। আমাদের উচিত আমদানিকারক থেকে উৎপাদক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে উজ্জীবিত করে তখন বলেন, আমরা কমপিউটার বানাব এবং রফতানিও করব। তিনি সেই দিনই টেশিসের দায়িত্ব আমার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাচক্রে বিষয়টি সেই সভার মিনিটসে আসেনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নটি আমার মতো আরও অনেকের কাছে একটি প্রয়োজনীয় ও বাস্তবিক উদ্যোগ বলে মনে হয়।

আশির দশক থেকে এখন অবধি বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের কিছু কমপিউটারের খবর আমরা জানি। কয়েকটির কথা আমি স্মরণ করতে পারি। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাবেক মহাসচিব মুনিম হোসেন রানার অ্যাক্সেস পিসি, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি সবুর খানের ড্যাফোডিল পিসি, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সদ্য সাবেক সভাপতি এএইচএম মাহফুজুল আরিফের সিএসএম, ফ্লোরা লিমিটেডের ফ্লোরা পিসি ও আনন্দ কমপিউটার্সের আনন্দ পিসিসহ অনেকেই নানা নামে ক্লোন পিসি বাজারজাত করেছেন। বেসরকারি ক্রেতাদের ডেস্কটপ পিসির বাজারটা প্রধানত ক্লোন পিসির দখলে। যদিও আমাদের নিজস্ব একটি ব্র্যান্ড গড়ে ওঠেনি, তথাপি ডেস্কটপ পিসির জগতে আমাদের নিজেদের হাতে সংযোজন করা পিসির দাপটই প্রধান। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো গুণগত মানের নামে ব্র্যান্ড পিসি কিনে থাকে। এই হীনমন্যতার জন্য কোনো দেশীয় ব্র্যান্ড বিকশিত হতে পারেনি। তবে বেসরকারি খাতে ব্র্যান্ড ডেস্কটপ পিসি কেউ কিনেনি। ল্যাপটপ যখন জনপ্রিয় হতে থাকে, তখন ডেস্কটপ পিসির এই বাজারটি সঙ্কুচিত হতে থাকে। ল্যাপটপের কোনো ক্লোন দেশে তৈরি হচ্ছিল না। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে সরকারের টেলিফোন শিল্প সংস্থার দোয়েল ল্যাপটপ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দোয়েল তার প্রথম চালানে বদনাম কামাই করে। পণ্যের গুণগত মান নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন ওঠে। এর বাইরেও দোয়েলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তী সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দোয়েল ল্যাপটপ কিনে অনেক ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড ল্যাপটপের চাইতেও ভালোভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই যে একবার বদনাম কামাই করা হলো, তার ফলে দোয়েল বেসরকারি ক্রেতাদের কাছে কোনো আকর্ষণই তৈরি করতে পারেনি। অন্যদিকে সরকারি কেনাকাটায় প্রথমেই বলা হয়ে থাকে, আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ব্র্যান্ড হতে হবে। দোয়েল সেই সীমা অতিক্রম করতে পারেনি–কারণ সেটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি জোগাড় করতে পারেনি। বাজারজাতকরণে এই প্রতিষ্ঠানটির চরম দুর্বলতাও এজন্য চরমভাবে দায়ী। এই বিষয়টি আমরা অন্য কোনো সময়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি।

আমাদনিকারক থেকে উৎপাদকের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বস্তুত একটি জাতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়কে অফিসিয়ালি কিছু সুপারিশ করেছে। এই বিভাগের সাবেক ▸

সচিব শ্যামসুন্দর সিকদার ৩০ মার্চ ২০১৬ অর্থমন্ত্রীর সাথে সরকারের সচিবদের বৈঠকে যে ধরনের প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন সেটি হচ্ছে– 'বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের এই সময়ে এখন প্রয়োজন দেশীয় পণ্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করা।' তার বক্তব্যের মূল সুর ছিল, ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে কমপিউটারের শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের ফলে কমপিউটারের ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু এখন সেই চাহিদা পূরণে হাজার হাজার কোটি টাকা আমদানি ব্যয় হচ্ছে। আগামীতে দেশের সরকারি অফিস-আদালত ও ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষার জন্য ডিজিটাল ডিভাইস দিতে হলে লক্ষ-কোটি টাকার আমদানি করতে হবে। এখন প্রয়োজন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, কমপিউটারের দেশীয় উৎপাদনকে সহায়তা করা। আমাদানিকারক থেকে উৎপাদকে পরিণত হওয়া। ৬ আগস্ট ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভায় সেই কথাই বলেছেন।

ক. এর জন্য সম্পূর্ণ উৎপাদিত কমপিউটার পণ্যের ওপর করারোপ ও ভ্যাট আদায় করা যায়। যন্ত্রাংশ বা কাঁচামালকে শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত করা যায়। এতে দেশের রাজস্ব বাড়বে এবং ডিজিটাল যন্ত্র দেশে উৎপাদিত হবে। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

খ. সফটওয়্যারের মতো হার্ডওয়্যার উৎপাদনকেও কর সুবিধা দেয়া হয়।

গ. সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশি ব্র্যান্ড কেনার বদলে দেশীয় ব্র্যান্ড ডিজিটাল ডিভাইস কেনার বিধান করা যায়। এর মান পরীক্ষা করার দায়িত্ব আইসিটি ডিভিশন নিতে পারে।

সচিব মহোদয় দেশীয় সফটওয়্যারের বিষয়েও তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, 'দেশীয় সফটওয়্যার ও সেবা খাত বড় হতে পারছে না, কারণ তারা দেশে কাজ করতে পারে না। বিদেশি সহায়তার বড় প্রকল্প করার ক্ষমতা তাদের নেই– টেন্ডারেও ওরা অংশ নিতে পারে না। সরকারি কাজে দেশি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' প্রসঙ্গত, তিনি এই কাজগুলোর সমন্বয়ের দায়িত্ব আইসিটি বিভাগকে দেয়ারও অনুরোধ করেন।

সচিব অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাথে কথা বলেন এবং সমিতির পক্ষ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬ অর্থমন্ত্রী, আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও আইসিটি বিভাগের সচিব শ্যামসুন্দর সিকদারের কাছে একটি পত্র লেখা হয় এবং তাতে দেশীয় শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সমিতির সাবেক সভাপতি এএইচএম মাহফুজুল আরিফ স্বাক্ষরিত এই পত্রে যেসব প্রস্তাবনা পেশ করা হয় সেগুলো হচ্ছে–

০১. ডিজিটাল পণ্য তথা কমপিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাব উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বেশ কয়েকটি মৌলিক যন্ত্রাংশ। এগুলো কোনো দেশ বা কোম্পানি এককভাবে উৎপাদন করে না। সবাই কারও না কারও পণ্য সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের ক্লোন পিসি যারা বানায় তারা এসব পণ্য আমদানি করে সংযোজনের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ড নামে বা নাম ছাড়া বাজারে অবমুক্ত করে। ফলে দেশের কমপিউটার হার্ডওয়্যার শিল্প গড়ে তুলতে গেলে এসব যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে ধার্য করা শুল্কমুক্ত সুবিধা চালু করা দরকার।

০২. ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক মানের প্লান্ট স্থাপন করতে হলে প্রয়োজন সুবিধাজনক জমি। তাই আমরা আশা করব, সব ইউটিলিটি সুবিধা দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কে এ জন্য উৎপাদক কোম্পানিগুলোকে পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে।

০৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি দেশি ব্র্যান্ডের আইটি পণ্যকে ভোক্তা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য সংবেদনশীলতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। তাই আইটি পণ্য ও সেবা উৎপাদককারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি বিক্রির আগেই উৎপাদিত পণ্যে অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) দিতে হয়, তবে তা শুধু চ্যালেঞ্জেরই নয় বিনিয়োজিত পুঁজি ঝুঁকির মুখে পড়ে।

০৪. স্থানীয় বাজারে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার স্বার্থে ভোক্তা পর্যায়ে এসব পণ্যকে সহজলভ্য করে তুলতে হলে দেশি উৎপাদিত পণ্য খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ ও বিক্রির ক্ষেত্রে সব ধরনের ট্যাক্স ও ভ্যাটমুক্ত রাখতে হবে।

০৫. দেশি উৎপাদক আইটি কোম্পানিগুলো যেন চাপমুক্ত হয়ে পণ্য বাজারজাতকরণে প্রণোদনা চালাতে পারে এবং দ্রুত বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে সে জন্য তাদের অর্জিত আয়কে করমুক্ত রাখার দাবি জানাচ্ছি।

০৬. দেশে ব্যবসায়রত আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে সুবিধা চালু করা দরকার।

০৭. একইভাবে এই খাতকে পোশাক শিল্পখাতের মতো সমৃদ্ধ করতে হলে দেশে উৎপাদিত আইটি পণ্যে রফতানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ক্যাশ ইনসেনটিভ চালু করতে হবে।

০৮. আমাদের দেশে শ্রমিক/কর্মীর প্রাচুর্য থাকলেও প্রযুক্তিদক্ষ মানবসম্পদ মোটেই সমৃদ্ধ নয়। ডিজিটাল শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই বাধা অতিক্রমের জন্য কারিগরি ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য একটি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যেতে পারে।

০৯. সর্বোপরি দেশের বাজার পেরিয়ে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড আইটি পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ধরতে সিবিটের মতো আন্তর্জাতিক মেলাগুলোতে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

এসব প্রস্তাবনায় মূলত উৎপাদিত পণ্যের যন্ত্রাংশ আমদানি শুল্ক, উৎপাদিত পণ্যের ওপর এটিভি, খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ ও বিক্রির ওপর শুল্ক ও কর এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর খাতে শূন্য ব্যবস্থা প্রচলনের অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া ১০ বছরের কর রেয়াত, শতকরা ৫ ভাগ নগদ ইনসেনটিভ, বিশ্বমেলাসমূহে শতভাগ সমর্থন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের দাবি করা হয়।

কিন্তু দুঃখজনক দিক হলো, সেবারের বাজেটে এসব সুপারিশের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে ডিজিটাল যন্ত্র স্বদেশে উৎপাদন করার সুবিধাজনক অবস্থাটি তখন হয়নি। বিষয়টি এরপর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা সম্ভব হয় ২০১৬ সালের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বেসিসের পক্ষ থেকে আমি যে বিষয়গুলোকে প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনতে সক্ষম হই, সেটির শীর্ষস্থানে ছিল আমদানিকে নিরুৎসাহিত করে দেশের উৎপাদনকে সহায়তা করা। এসব প্রস্তাবনা নিয়ে ২০১৭ সালে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও বেসিসসহ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বাণিজ্য সংগঠনগুলো তাদের ২০১৭-১৮ সালের বাজেট প্রস্তাবনায় দেশীয় উৎপাদনকে সুরক্ষা দেয়ার দাবি তুলেছে। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমদানি করা পণ্যের দাম যন্ত্রাংশের চেয়ে বেশি। মোবাইলের যন্ত্রাংশ আমদানিতে শতকরা ৩৭ ভাগ শুল্ক থাকলেও পুরো মোবাইল সেটের ওপর শুল্ক ছিল শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। এর ফলে দেশে মোবাইল সংযোজন করাও সম্ভব ছিল না। এবার ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে তাই বাস্তবে রূপ দেয়া হয়। কর কাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে এখন দেশে ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদন করা একটি লাভজনক বিষয়।

তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, এবারের বাজেটের জন্য বাংলাদেশ বসে থাকেনি। এরই মাঝে দেশের অন্যতম প্রধান ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদক ওয়ালটন ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে দেশি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বাজারে ছেড়েছে। ল্যাপটপটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এর উদ্বোধন করেন। একই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ল্যাপটপ উৎপাদনের কারখানা তৈরি করছে। ডিসেম্বরে এটি চালু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরই মাঝে ওয়ালটন তাদের স্মার্টফোন উৎপাদন শুরু করেছে। উই মোবাইল কোম্পানি নভেম্বরে তাদের কারখানা চালু করেছে। সিম্ফনি তাদের কারখানা চালু করতে যাচ্ছে। এমনকি বিশ্বখ্যাত কিছু ব্র্যান্ডও দেশে কারখানা স্থাপনের কথা ভাবছে। ওয়ালটন পুরো বিষয়টিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা এখন ট্যাব-কিবোর্ড, মাউস, পেনড্রাইভ, ডেস্কটপ পিসি বাজারজাত করছে। এমনকি তারা স্মার্ট টিভি এবং আইওটি ফ্রিজ বাজারজাত করছে।

এবারের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যকে রফতানি ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে শুধু যে দেশীয় কলকারখানার জন্য সহায়ক হয়েছে সেটাই নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোও এখানে উৎপাদন করে বাইরে রফতানি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ পাবে।

এর ফলে দেশটি আমদানিকারক থেকে উৎপাদক ও রফতানিকারকের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি, এরই ধারাবাহিকতায় আমরা শিল্পযুগের তিনটি স্তর মিস করেও চতুর্থ স্তরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখতে পারব কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com